আমাদের লক্ষ্য ও পথচলার নীতি

গ্রন্থনা
মোহাম্মদ জোবায়ের হোসাইন

আমাদের লক্ষ্য ও পথচলার নীতি
মোহাম্মদ জোবায়ের হোসাইন

প্রকাশনায় :
আই. এস. সি. এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৭১৩০
ওয়েব : www.iscabd.org
ফেইসবুক : www.fb.com/iscabd91

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : জুলাই -২০০৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর - ২০০৮
পরিমার্জিত তৃতীয় প্রকাশ : জুন - ২০১৪

নির্ধারিত মূল্য : ১২ (বার) টাকা মাত্র

AMADER LAKKHA O PATH CHALER NEETI
by
Md. Jobaer Hossain, Published by I.S.C.A Publications
55/B Purana Paltan (3rd Floor), Dhaka- 1000
Fixed Price - Taka 10.00 Only

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি লক্ষ্য থাকে। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই জীবনের সকল কার্যক্রম আবর্তিত হয়। লক্ষ্যহীন কাজ সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের নিকট প্রত্যাশা করা হয় না। জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে লক্ষ্যার্জনে নিরলস সাধনা ও ক্লান্তিহীন অগ্রযাত্রাই প্রত্যেক মানুষের জন্য কাম্য। একজন ছাত্র তার ছাত্র জীবনের শুরুতে গোটা জীবনের লক্ষ্যকে নির্ধারণ করে নেয়। নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য সে অবলম্বন করে যথোপযুক্ত পথ ও পথ চলার কৌশল এবং সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। কেউ ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা করলে তাকে প্রথম থেকেই যেমনি মেডিকেল সাইন্সের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে আয়ত্তে আনতে হয়, একইভাবে কেউ মুফাস্‌সির হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলে তাকেও তাফসীর শাস্ত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পৌছতে হয়। তাই বিষয়টা দাড়ালো এই–ব্যক্তি কোথায় পৌঁছবে সে অনুযায়ী তাকে চলার পথ নির্বাচন করতে হবে। ডাক্তার হওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে তাফসিরগ্রন্থের ওপরে অধ্যয়ন করলে যেমনি ডাক্তার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব হবে না; ঠিক একইভাবে মুফাস্‌সির হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হবে না মেডিকেল সাইন্স অধ্যয়নের মাধ্যমে। প্রথমে লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং সাথে সাথে লক্ষ্যার্জনে নির্দেশিত পথ ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এখন লক্ষ্য নির্ধারিত হলো, চলার পথও মনোনীত হলো; কিন্তু পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌছার ধৈর্য বা কষ্ট অসহনীয় মনে হচ্ছে, তাহলে ফলাফল কি হবে? নিশ্চিতভাবে শূন্যের কোঠায় ফলাফল অবস্থান করবে। লক্ষ্য ও চলার পথ নির্ধারিত হওয়ার সাথে সাথেই কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌছার জন্য সময় ও প্রেক্ষাপট বিবেচনাপূর্বক ধারাবাহিক কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ দুঃসাহসী অগ্রযাত্রাকেই আমরা বলব প্রস্তুতিপর্ব। প্রস্তুতিপর্ব যতটা দ্রুতগতি সম্পন্ন সময়োপযোগী ও সঠিক হবে; লক্ষে পৌছাও ততটা সম্ভাবনাময়ী, সহজ ও ঝুঁকিহীন বলে বিবেচিত হবে। বাঁধা ও প্রতিকূলতার গিরিসম প্রাচীর অতিক্রম করে পথ চলতে পারলেই লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হবে। অতএব চাই শুধু অসীম সাহস, অদম্য মনোবল। আমরা আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মাখলুক। আল্লাহ আমাদের রব। আমরা তাঁর বান্দাহ। আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে দুনিয়াতে এসেছি এক মহান মিশনের জিম্মাদারী নিয়ে। অতএব, একজন জিম্মাদার হিসেবে খুঁজে দেখার প্রয়োজন রয়েছে এ মিশনের লক্ষ্য কী? কেনই বা এ লক্ষ্য? এবং কাঙ্ক্ষিত এ লক্ষ্য অর্জিত হবে কোন পথে?

আমাদের লক্ষ্য

আমরা সমাজ পরিবর্তনের এক দুর্জেয় কাফেলা। জাহিলী এ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই যার লক্ষ্য; নির্যাতিত নিপীড়িত মাজলুম মানবতাকে বন্দীত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তির পথ দেখানোই যার নেশা; চিরশান্তির নিকেতন ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই যার সাধনা; শাহাদাতের অমীয় সুধা যার আকাঙ্ক্ষা; সে অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী সংগঠন ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন। আমরা ছাত্রসমাজ; তার চেয়ে বড় পরিচয় আমরা আল্লাহর বান্দাহ। একজন সচেতন ছাত্র হিসেবে শুধু পার্থিব জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণেই আমরা তুষ্ট নই। আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে বন্দেগীর চাহিদা মিটাতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা আল্লাহপাকের খলিফা মনোনীত হয়ে এসেছি তাঁরই সৃষ্টি এ ধরায়। খিলাফতের দায়িত্বপালনের মাধ্যমে আমরা নিরঙ্কুশ বন্দেগীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। আমরা প্রচলিত এ সমাজব্যবস্থার চির অবসান চাই, আল্লাহর সৃষ্ট জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়তো শাহাদত; নয়তো ইসলামী হুকুমত। এ আকাঙ্ক্ষাকে সামনে নিয়েই নির্ধারিত হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য :

"জাহিলিয়াতের সকল প্রকার আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায় ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথে মানবজীবন গঠন ও সমাজের সর্বস্তরে পূর্ণ দীন বাস্তবায়ন।"

এ লক্ষ্য আমাদেরকে দুটি কাজ সম্পন্ন করার স্পষ্ট তাগিদ দেয়। যথা–

১. জাহিলিয়াতের অবসান ঘটানো।

২. ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথমটি প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গার তাগিদ আর দ্বিতীয়টি কাঙ্ক্ষিত নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান। একটি জুলুমের প্রতীক আর অপরটি শান্তির নীড়। উভয়ের অবস্থান বিপরীত মেরুতে; একের সাথে অন্যের সমঝোতা কল্পনাও করা যায় না। অর্থাৎ জাহেলী সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করে বা এর সাথে আপস করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্তই বোকামী। জাহিলিয়াতের ধ্বংসস্তুপের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ইসলামী হুকুমতের কাঙ্ক্ষিত প্রাসাদ। খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায় সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথেই এ প্রাসাদের ভিত্তি তৈরি হবে। উপরোক্ত কাজ দুটির সম্মিলিত ফলাফলকেই বলা হয় সমাজবিপ্লব। সমাজবিপ্লব আমাদের চূড়ান্ত চাহিদার প্রত্যাশা এবং বিপ্লবের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া আমাদের আমৃত্যু সাধনা। কিন্তু এ কাঙ্ক্ষিত চাহিদার প্রাপ্তি মোটেও সহজ সাধ্য নয়; বরং বিরামহীন ও অক্লান্ত চেষ্টা মেহনতের সফলতা হিসেবে এ প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে পরিণত হয়।

কোন একটি ভূখণ্ডে যদি কোন জনগোষ্ঠী সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যাশা করে, সে প্রত্যাশা পূরণের প্রথম শর্ত হিসেবে তাদেরকে নির্ধারিত লক্ষ্য ও নীতিমালার আলোকে সংগঠিত হতে হয়। সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় নতুন সৃষ্ট এ অবকাঠামোকে সংগঠন হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি লক্ষ্য অর্জনের চূড়ান্ত অভিপ্রায় নিয়ে গঠিত সংগঠনের পরবর্তী কাজ ইলম, আমল ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের একদল যোগ্য ও নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা। এরাই হবে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি বা নেতৃত্ব। সমাজবিপ্লবের এ চলমান পথকে অধিকতর সহজ ও গতিশীল করতে প্রয়োজন বিরামহীন দাওয়াতী কার্যক্রম। দাওয়াতী কার্যক্রম সমাজবিপ্লবের কাফেলাকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবে। সংগঠিত হবে নতুন নতুন প্রতিভা ও প্রতিনিধিত্বশীল জনগোষ্ঠী। সংগঠনের পরিকল্পনার অধীনে এ সকল কর্মসূচীগুলো যত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে, তত দ্রুতই নেতৃত্ব গঠনের চাহিদা পূর্ণ হবে এবং বিপ্লবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

জাহিলিয়াত কি?

জাহিলিয়াত (Ignorance) আরবী শব্দ; যার প্রতিশব্দ অজ্ঞতা, মুর্খতা, নির্বুদ্ধিতা, অন্ধকারাচ্ছন্নতা। কোন কাজ তার নির্ধারিত নিয়মে সম্পন্ন হলে সে কাজকে স্বীকৃত ধরা হয় এবং কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে নিয়মের বাইরে সম্পন্ন কাজ অবশ্যই বিপরীত নামে অভিহিত হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান কম্পিউটারের সৃষ্টি ও ব্যবহারবিধি তুলে ধরা যেতে পারে। কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় আবিস্কার। মহাকাশ থেকে শুরু করে সাগর অতলের নিখুঁত তথ্য পর্যন্ত কম্পিউটার সরবরাহ করছে একটিমাত্র বাটনের চাপে। এটি একটি সয়ংক্রিয় যন্ত্র; তবে পরিচালিত হয় নির্ধারিত নিয়মে। কে এ নিয়মের প্রবক্তা? যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ কম্পিউটার উদ্ভাবন করেছে, সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রণীত নিয়মাবলীই কম্পিউটারটিকে কার্যক্ষম করতে পারে। অর্থাৎ একটি তথ্যবুক যন্ত্রটিকে জীবনি শক্তি দান করে। তথ্যবুক নির্ধারিত নির্দেশনার বাইরে বহুল উপকারী এ যন্ত্রটি কোনরকম সহযোগিতা করতে ব্যর্থ। আবার নির্দেশনার বাইরে কোন আচরণ করলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির প্রবল আশংকাও থাকতে পারে। জাগতিক যেকোন ক্ষেত্রে আমরা এটা নির্দিধায় স্বীকার করছি যে, উদ্ভাবক বা সৃষ্টিকারীর দেওয়া নির্দেশনার বাইরে সকল সৃষ্টিই অচল। এটাই আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের স্বাক্ষ্য। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় যে, এ চিরন্তন সত্য সৃষ্টির সেরা মাখলুক মানবজাতির জীবনে চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছে। জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে মানুষ নিজ বুদ্ধির যৌক্তিকতা দ্বারা বিশ্লেষণ করার

সুযোগ পেলেও নিজের অস্তিত্বকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ আজও সৃষ্টি হয়নি। তাই তো মানবজাতি অশান্তির প্রাচীরে আবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় ছটফট করছে। মানুষ আজও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেনি, তার সৃষ্টিকর্তা কে? কেন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিজ জীবন পরিচালনার নির্দেশনাই বা কি? আর মানুষ কেনইবা নির্দেশনার বিপরীতে অবস্থান করছে? এ চিন্তা মানবজীবনের স্থিতি ও বিকাশ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বড্ড বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিজ জীবনের উৎস, পরিচালনা পদ্ধতি ও পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে অচেতন মানুষ কতই না অজ্ঞ! ক্রমবর্ধমান অজ্ঞতা সমাজ, সভ্যতা ও মানবতাকে দিনদিন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষ তার উদ্ভাবিত যন্ত্রটিকে পরিচালনার জন্য একটি নির্দেশিকা বুক বা Catalogue এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল; অথচ তার সৃষ্টিকর্তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দেওয়া বিধানকে নিজ জীবনের জন্য অনুপযোগী ও অবহেলার বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করল, এর চেয়ে বড় অজ্ঞতা আর কী হতে পারে? মানুষ যখন স্বীকার করবে তার একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এবং চিন্তা করবে তার সৃষ্টিকর্তা তাকে অহেতুক সৃষ্টি করেন নি, কোন মহৎ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন, তখন তাকে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত জীবনাদর্শ (নির্দেশিকা) অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। এটাই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। এর বাইরে সকল আচরণই হবে নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা বা জাহিলিয়াত।

জাহিলিয়াত আজ ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণ তথা গোটা জীবনব্যবস্থায় জটিলতর অবস্থান তৈরি করে রেখেছে। ব্যক্তিজীবন কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল, আর আমরা কিভাবে পরিচালনা করছি; সমাজজীবনের নির্দেশিত পন্থা কি হওয়া উচিত ছিল, আর কতটা কদর্যে এসে আমরা পৌঁছেছি; রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংবিধানে কোন বিধিবিধান প্রণয়ন উপযোগী, আর কোনটা প্রচলিত রয়েছে; জাতীয় শিক্ষানীতির অবকাঠামো কিরূপ হওয়া উচিত, বিপরীতক্রমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে কী উপহার দিচ্ছে। অর্থনৈতিক মুক্তির প্রকৃত পথ কোনটি, আর আমরা কেনইবা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার যাতাকলে নিস্পেষিত হচ্ছি; সাংস্কৃতিক অঙ্গণকে কিভাবে সাজানো উচিত, আর চলমান সংস্কৃতি আমাদেরকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে; প্রতিটি বিষয়কে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলেই প্রচলিত এ ব্যবস্থাপনার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হবে, এ সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব হবে।

ব্যক্তিজীবনে জাহিলিয়াত

যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাকে বলা হয় আস্তিক; পক্ষান্তরে যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়; তাকে বলা হয় নাস্তিক। সৃষ্টিজগতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানবজাতি। অতএব একজন মানুষের জীবনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

মানুষ আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সকল সৃষ্টি সম্ভার সাজানো হয়েছে শুধু মানুষেরই জন্য। স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে মানুষের জন্য চিন্তার নিদর্শন, রয়েছে সৃষ্টিকর্তাকে চেনা ও জানার অবলম্বন। যার জন্য স্রষ্টার এতো আয়োজন, সেই নাকি জানে না তার সৃষ্টিকর্তা কে! মানে না সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে!! কত বড় আশ্চর্যের কথা। ডারউইনের বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে, সৃষ্টিজগত আপন গতিতেই সৃষ্টি। এমনিতে এমনিতেই (কোন শক্তির ইশারা ব্যতীতই) এ ধরার প্রতিটি জীব ও বস্তুকণা অস্তিত্ব লাভ করেছে। এককোষী প্রাণী বিবর্তনের মাধ্যমে বহুকোষী প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এভাবে সেজেছে এ সুন্দর ধরা। এর পেছনে কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই। আজকে যেসব মানুষগুলো এ চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত, তারাই আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে খোদাদ্রোহী মতবাদের শৃঙ্খলে আটকে পড়েছে। এ ভুল চিন্তা থেকেই শুরু হয় একজন বস্তুবাদীর পথ চলা এবং এভাবেই জাহিলিয়াত ব্যক্তিজীবনকে কলুষিত করে। যদি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকণার গতি, আবর্তন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যদি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর জীবের জীবন-জীবিকা বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে বেরিয়ে আসবে।

একজন মানুষ যদি তাঁর নিজ সৃষ্টিরহস্য, বিবর্তন, জীবন-জীবিকা, পরিণাম-পরিণতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে নিজ অস্তিত্বের মাঝেই সে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাবে। এবার যদি নিজ অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অসীম সৃষ্টিজগতে চোখ বুলায়, তাহলে মানুষ পাবে স্রষ্টার একত্ববাদ। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রসহ প্রতিটি বস্তুর নিয়মতান্ত্রিক আবর্তন এবং জীব-জন্তু, পশু-পাখির বেঁচে থাকা ও জীবন পরিচালনার নিয়মতান্ত্রিকতা আমাদের সামনে সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদে বিশ্বাসী, সেই ঈমানদার; অন্যরা পথভ্রষ্ট। এখন যদি একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় অথবা সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার অংশীদারিত্বের চিন্তা করা হয়, তাহলে সুন্দর এ ধরা সবচেয়ে বেশি অনিয়মতান্ত্রিকতায় রূপ নিবে। অথচ সৃষ্টিজগতের সুশৃংখল নিয়মতান্ত্রিকতাই আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট। এ বাস্তব যৌক্তিকতাকে উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করছে, এবং তারই দেওয়া নিয়ম-কানুন ও বিধান নিজের

জন্য অনুপযোগী মনে করছে তার চেয়ে চরম অজ্ঞ আর কেউ হতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি তার স্রষ্টাকে স্বীকার না করে এবং ব্যক্তিজীবনে স্রষ্টাপ্রদত্ত আহকামের বাস্তবায়ন না করে, সে একজন জাহেল বা অজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যক্তিজীবনের এ অজ্ঞতাই সামষ্টিক জীবনে জাহিলিয়াতের বিস্তার ঘটায়।

সমাজজীবনে জাহিলিয়াত

আধুনিক এ সমাজব্যবস্থা জাহিলিয়াতের অক্টোপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে। সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য মানুষ চিরন্তন সংগ্রামে অবতীর্ণ। সমাজকাঠামো খুন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা ও অসামাজিক কার্যক্রমে কলুষিত হোক–এটা কোন বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রত্যাশা করে না। অথচ প্রতিনিয়ত এ সমাজে এসব কদর্যপূর্ণ কাজগুলো সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানবজাতি কর্তৃক অতি স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। নৈতিকতা বিরোধী কাজ এতটাই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে যে, এগুলো নৈতিকতা বিরোধী এবং এ অবস্থার যে পরিবর্তন প্রয়োজন সে অনুভূতিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। অধিকন্তু দিনদিন এর সংখ্যা বাড়ছে।

যে সমাজব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত সুন্দরের পরিবর্তে অসুন্দরের আধিক্য বাড়ছে, মানবতার পরিবর্তে পশুত্বের প্রাধান্য বিস্তৃত হচ্ছে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হেফাযতের ন্যূনতম নিশ্চয়তা যেখানে নেই, যেখানে might is right নীতিকথায় রূপান্তরিত হয়েছে, যে সমাজব্যবস্থায় মেকী প্রভু সেজে গোটা জনগোষ্ঠীর রক্তচুষে খাচ্ছে, কতগুলো মানুষরূপী দানব আর ক্ষুধার যাতনা নিভৃতের জন্য অসহায় বনি আদম নর্দমার পঁচা খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে বন্ধুপ্রতীম নির্বোধ পশুর সাথে; যে সমাজ এ বিশাল ভূখণ্ডে সৃষ্টির সেরা আদম সন্তানের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিতে

পারছেনা। অথচ বিলাসবহুল হোটেলে মদ-নৃত্যের আবর্তে রাত কাটাচ্ছে সমাজপতিরা, যেখানে পরিধেয় শীতবস্ত্রের অভাবে মরছে অসহায় মানুষ, যেখানে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আলোকিত হতে পারছে না অধিকাংশ জনগোষ্ঠী, চিকিৎসার অপ্রতুলতায় ধুকে ধুকে মরছে কত স্বজনহারা; সে সমাজব্যবস্থাকে সভ্যতার যত আবরণ দিয়েই আচ্ছাদিত করা হোক না কেন তাকে সভ্যসমাজ বলা যাবে না, বলতে পরি না; এতো সভ্যতার নামে নিরেট জাহিলিয়াত! এতো মুখোশধারী নব্য জাহিলিয়াত!! এতো একুশ শতকের মানবতা বিরোধী জাহিলিয়াত!!!

শিক্ষাক্ষেত্রে জাহিলিয়াত

শিক্ষা হলো জাতি গঠনের মূল হাতিয়ার। একটি জাতি নিজেদেরকে কিভাবে গড়তে পারবে শিক্ষাব্যবস্থাই তা বলে দিবে। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকেই গড়ে ওঠে

জাতিসত্তা; গড়ে ওঠে নতুন প্রজন্ম। জাতীয় শিক্ষানীতি যদি অনৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সে শিক্ষানীতি কোনদিনও নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি উপহার দিতে পারে না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, যেখানে শতকরা নব্বই ভাগ লোক মুসলমান। অতএব ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তিতেই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়ার কাথা ছিল যৌক্তিক। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো–জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় চিন্তা বা নৈতিকতার কোন স্থান নেই; বিধায় বস্তুবাদী চিন্তা ও জাগতিক চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থার উপস্থিতিতে তৈরি হচ্ছে চরিত্রহীন ও দুর্নীতিবাজ নতুন প্রজন্ম। চরম বাস্তবতা হলো, আজ সমাজব্যবস্থার সর্বত্রই অন্যায়-অবিচার ও প্রশাসনিক কাঠামো দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সঙ্গত কারণেই ন্যায়বিচার প্রাপ্তি শুধুই দুরাশায় পরিণত হয়েছে। সকল সমস্যার কারণ বিশ্লেষণপূর্বক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই একথার স্বীকৃতি দিবেন যে, ক্রটিপূর্ণ জাতীয় শিক্ষানীতিই সকল সমস্যার মূল। এ ভ্রান্ত শিক্ষানীতিকে আমরা বলবো জাহেলী শিক্ষাব্যবস্থা। অতএব প্রচলিত জাহেলী শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে আমরা নৈতিকতা সমৃদ্ধ সর্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাই। সার্বজনীন ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে ব্যাপক জনমত গঠনের মাধ্যমে জাহেলী শিক্ষাব্যবস্থার অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পাবে এবং এটাই আমাদের বিশ্বাস।

রাষ্ট্রীয় জীবনে জাহিলিয়াত

রাষ্ট্রীয় নীতিমালার প্রভাবে সমাজ ও ব্যক্তিজীবন প্রভাবিত হয়। তাই ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের জাহিলিয়াত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা কর্তৃক সৃষ্ট। সাংবিধানিক জটিলতা বা অজ্ঞতা আজ গোটা সমাজকাঠামোকে কলুষিত করছে। দেশের ভারসাম্যহীন সমাজকাঠামো, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক কাঠামো, অসম অর্থ ও শ্রমনীতি, বৃটিশ প্রবর্তিত ধ্বংসাত্মক শিক্ষানীতি, নৈতিকতা বিবর্জিত সাংস্কৃতিক অঙ্গণ; গোটা বিষয়ই সাংবিধানিক ত্রুটির ফসল। মানবরচিত সংবিধান চিরন্তন বা স্থায়ী হতে পারে না, পারে না মানুষের সৃষ্ট সমস্যার সমাধান এনে দিতে। মানবসমাজের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে একটিমাত্র পথে, তা হলো মানুষেরই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রভুত্ব পতিষ্ঠার মাধ্যমে, তাঁরই প্রদত্ত বিধানানুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে। অর্থাৎ বস্তুবাদী কুফরী সংবিধানের চির অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব-সার্বভৌমত-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় জীবনে জাহিলিয়াত দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

দেশের প্রচলিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বানিয়ে সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ ঘোষণা করছে–"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক

জনগণ।” অথচ মানবজাতির রব তাঁর গোলামদের জীবন চলার নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন–
অর্থ : “সার্বভৌম ক্ষমতার (সংবিধান প্রণয়নের) মালিক একমাত্র আল্লাহ।”(সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০)
এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, প্রভুত্ব বা সার্বভৌমত্ব নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অথচ যে সংবিধান মানুষকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও রবুবিয়াতের অংশিদার করল এবং সার্বভৌম ক্ষমতার চ্যালেঞ্জে মাখলুক মানবজাতিকে মহান আল্লাহর মোকাবেলায় নিয়ে আসল, কত জঘণ্য এ সংবিধান! কত বড় জাহেল ও বর্বর সংবিধানের ধ্বজাধারী এ মানুষগুলো!! কতটা জাহিলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত এ রাষ্ট্রকাঠামো!!! তা ভাবতেও বিস্ময় হয়।
সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকাঠামো অনৈতিকতার হাতিয়ার– মদ, ব্যাভিচার এবং নির্যাতন-শোষণের হাতিয়ার সুদকে বৈধ করেছে। অথচ শান্তিময় সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে এসব অনৈতিক ও অশুভ বিষয়াবলীর মূলোৎপাটনে কঠোরতম নির্দেশনা দিয়েছেন। যে বিধি-বিধান মানুষকে মানুষের গোলাম বানাচ্ছে, যে আইন অপরাধ দমনের পরিবর্তে প্রতিনিয়ত নবতর অপরাধ সৃষ্টি করছে, যে সংবিধান প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে মানবজাতির গাইডবুক কুরআনকে বাতিল বলে দম্ভোক্তি করছে, সে সংবিধানকে অমরা কিভাবে মূল্যায়ন করতে পারি? সে সংবিধানকে আমরা কি নামকরণ করতে পারি? সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদ ঘোষণা করছে–“জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্যকোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততক্ষাণিক বতিল হইবে।” সংবিধানের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ ঘোষণাকে কোন ঈমানদার স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে না । এ ঘোষণা কর্তমান থাকবে; অথচ এ সংবিধানকে আমানত মনে করে এর অধীনে জীবন-যাপন করাকে পরম সৌভাগ্যের মনে করতে হচ্ছে- কতই না দুর্ভাগা ও লাঞ্চিত এ জনগোষ্ঠী। গবেষণায় প্রকাশিত যে, সংবিধানের এই একটিমাত্র অনুচ্ছেদ কুরআনুল কারীমের ৩০০ থেকে ৩৫০ আয়াতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অস্বীকার করছে। কুরআনুল হাকীমের শাশ্বত বিধান কায়েমের মাধ্যমে রাষ্ট্রব্যবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তো দূরের কথা; এ চিরন্তর সংবিধানকে অস্বীকার করার মতো ধৃষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা শুনে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই শিহরিত হয়ে উঠেন। জাহিলী সংবিধান কুরআনে কারীমকে অচল, অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল ঘোষণা করে কুফরী সংবিধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানবরচিত এ কুফরী সংবিধান

গোটা রাষ্ট্রকাঠামোকে জাহিলিয়াতের গহ্বরে নিমজ্জিত করে রেখেছে, গোটা জাতিকে করেছে মেকী প্রভুত্বের শৃঙ্খলে বন্দী।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাহিলিয়াত

অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থনীতি পরিচালিত হয় শোষণের মাধ্যমে, সেখানে মানবতা লাঞ্চিত হবে, নির্যাতিত হবে; এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিংব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সুদের মাধ্যমে। সুদ এমনি একটি হাতিয়ার, যা বিত্তশালীদের অঢেল সম্পত্তিকে পাহাড়ে রূপান্তরিত করে; গরীবকে শেষ সম্বল হারিয়ে পথের ভিখারী করে। এ সুদের মাধ্যমে দেশের অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার কারণেই শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি জনগোষ্ঠী দারিদ্র-সীমার নীচে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আর ফলাফল ভোগ করছে জাতি ও মানবতার দুশমন রক্ত পিপাসুরা। জাতীয় অর্থনীতির বিশাল অংশ আজ অবৈধ উপায়ে কুক্ষিগত করে রেখেছে, কতিপয় শোষক শ্রেণি ও তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা। একইভাবে দরিদ্রবিশ্বের ওপরে মোড়লীপনা করছে ধনীক শ্রেণি। কেউ না খেয়ে ধুকে ধুকে মরছে; আর কেউ বিলাসবহুল অনৈতিক জীবন-যাপন করছে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই আজ কঙ্গো, নাইজেরিয়া ও সোমালিয়ার মতো ভূখণ্ডে দারিদ্রের ভয়াবহ চিত্র তৈরি করে রেখেছে। আবার এ ব্যবস্থাই আমেরিকার মতো মানবসভ্যতা বিধ্বংসী দাম্ভিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। ইসলাম একটি সুন্দর ও শান্তিময় অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছে, যার মাধ্যমে অর্থনীতিতে সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় এবং সমাজে ধনী-গরীবের বৈষম্য ঘুচে যায়। একদিকে ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার অধিকার দিয়েছে, সাথে সাথে সম্পত্তির শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এতে করে অধিক সম্পত্তির পাহাড়ও সৃষ্টি হচ্ছে না এবং সুসম অর্থ-বণ্টন নিশ্চিত হওয়াতে অর্থব্যবস্থার ভারসাম্যতা বজায় থাকছে। আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতিবিদদের একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সুদ ব্যবস্থা রহিত করা হলে দেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কিভাবে পরিচালিত হবে? একথা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাতে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার হতাশা কাটিয়ে দিতে নিশ্চিতভাবে সক্ষম হবে। দেশের সঞ্চিত সম্পদ ও গচ্ছিত অর্থের যাকাত আদায় ও উপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে ৫ বছরের ব্যবধানে অন্তত ভিক্ষুকমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেওয়া সম্ভব হবে। চ্যালেঞ্জের সাথে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো ভূখণ্ডে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নিশ্চিতভাবে স্থিতিশীল অর্থনীতি উপহার দেওয়া সম্ভব। প্রশাসনিক দুর্নীতি ও বিলাসবহুল জিন্দেগী পরিহার, সুসম অর্থ-বণ্টননীতি প্রণয়ন

এবং ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ১০ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে একটি সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক অঙ্গণে জাহিলিয়াত

দেশ আজ পাশ্চাত্য ধারার সংস্কৃতির প্রবাহে ভাসমান। একদিকে সুস্থ-সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশে গৃহিত উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব; অপরদিকে আমদানীকৃত অপসংস্কৃতির অবাধপ্রবাহ। সুস্থ-ধারার সংস্কৃতি চর্চার উদ্যোগ থাকলেও সহযোগী পরিবেশের অভাব থাকাতে এবং প্রতিকূল পরিবেশের কারণে এ ধারার সংস্কৃতি বিকশিত হতে পারছে না। পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক কূট-পরিকল্পনা ও জাতীয় গাদ্দারীর ফলস্বরূপঅপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে আমরা নিমজ্জিত। কোন জাতির অগ্রগতিকে প্রতিহত এবং অস্তিত্বকে ধ্বংস করার জন্য সে জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করাই যথেষ্ট। এ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়েই দেশের সর্বত্র অপসংস্কৃতি আমদানী করা হচ্ছে। যে সংস্কৃতি মানুষকে মানবতাহীন করে, যে সংস্কৃতি নগ্নতা ও বেহায়াপনার বিস্তৃতি ঘটায়, যে সংস্কৃতি যুব-সমাজকে অনৈতিকতার শেষ অবস্থানে পৌঁছায়, যে সংস্কৃতি একটি সভ্যজাতিকে ধ্বংসের চক্রান্তে সু-পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাকে কোন সুস্থ সংস্কৃতি বলা যায় না; এতো সংস্কৃতির নামে জাহিলিয়াতের উম্মাদনা।

একুশ শতকের নব্য জাহিলিয়াত

একুশ শতক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ যুগ; সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের যুগ। এ যুগে মানুষ মঙ্গলগ্রহকে করেছে প্রতিবেশী, অভিযান চলছে দূর নক্ষত্র আবিস্কারের পথে। সমুদ্রের অজানা ও অকল্পনীয় অনেক তথ্যই আজ স্বাভাবিক জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে মানুষ দূর গ্রহে আবাসন গড়ার পরিকল্পনায় সদা ব্যস্ত। আবিস্কৃত হয়েছে নিউক্লিয়ার বোমা, পারমানবিক বোমা ও রাসায়নিক বোমার মত অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। মানুষের আবিস্কৃত প্রযুক্তি আজ ব্যবহৃত হচ্ছে নিজ হাতে গড়া সভ্যতা ধ্বংসের তৎপরতায়। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এ ধারণা করা হচ্ছে যে, মানবসভ্যতার বিকাশে আবিস্কৃত প্রযুক্তিই হয় তো একদিন ধ্বংস করবে নিজেদের গড়া সভ্যতাকে। আশংকা করা হচ্ছে, পৃথিবী নামক এ গ্রহটির অস্তিত্ব ধ্বংস্তুপে রূপান্তরিত হবে–এ বিজ্ঞানেরই অভিশাপে। মানুষ ফিরে যাচ্ছে নিকৃষ্টতম বর্বরতায় ও নবতর জাহিলিয়াতের পথে। মানবকল্যাণে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষ ধ্বংসের কাজে। নারী-পুরুষ, শিশু হত্যা ও বন্দী হত্যার মতো বর্বর হত্যাযজ্ঞ মানবাধিকারের এ যুগে অতি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন

হচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানবতা জঠর যন্ত্রণা নিভৃতের জন্য অনৈতিকতার আশ্রয় নিচ্ছে; অথচ এ সভ্য পৃথিবীতেই নির্যাতিত মানুষগুলোর কষ্টার্জিত অর্থে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে। একদিকে যুদ্ধ বিমানের কার্পেট বম্বিংয়ে লাশের স্তুপে পরিণত হচ্ছে নিরাপরাধ মানুষগুলো; তার সাথে সাথেই আবার বিমানের মহড়া খাদ্যপ্যাকেট ছুড়ে মারছে রক্তাক্ত মানুষগুলোর ক্ষুধা নিবারণে। একদিকে পরিকল্পনা হচ্ছে কিভাবে অধিকতর কার্যক্ষমতা সম্পন্ন মারণাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ চালানো যায়, অপরদিকে শান্তনার টিম গঠন করে বোমার ক্ষতস্থানে ঔষধের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। ধ্বংসাত্মক কাজের পরিকল্পকই নিজেকে মহানুভব বলে পরিচিত করছে। কত বড় প্রহসন! কত বড় জাহিলিয়াতের গহ্বরে মানবতা নিমজ্জিত!! বসনিয়া, চেচনিয়া, ভিয়েতনাম, কসোভো, আরাকান, আফগান, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, গুজরাট ও ইরাকের মাটিতে সংঘটিত ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ একুশ শতকের জাহিলিয়াতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ নব্য জাহিলিয়াতের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে মানবতা কি মুক্তি পাবে না?

জাহিলিয়াত থেকে মুক্তির আহ্বান

সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা দেখলাম–সর্বত্রই জাহিলিয়াতের সয়লাব। প্রতিষ্ঠিত এ জাহিলিয়াত আলোকিত সমাজব্যবস্থার পথে বাঁধা। এর সাথে সমঝোতা বা আপস করে সত্য প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। আলো ও অন্ধকার যেমন একই গৃহে অবস্থান করতে পারে না, তেমনিভাবে জাহিলিয়াতের সাথে সত্যের সহাবস্থান কল্পনাও করা যায় না। অতএব সত্য পতিষ্ঠার আহ্বানে নিবেদিত প্রাণ সৈনিকদের সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন জাহিলিয়াতকে স্বীকৃতি না দেওয়া হয়। জাহিলিয়াত সমাজকাঠামোতে ফিৎনার স্থায়ী আবাসন গড়ে তুলেছে; আর ফিৎনার চির অবসানকল্পেই আমাদের সংগ্রাম।
ইরশাদ হয়েছে–
অর্থ : "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখ; যতক্ষণ না ফিৎনার (জাহিলিয়াতের) অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হয়।"(সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৯)
আল্লাহর পথের সৈনিকেরা জীবনবাজী রেখে জাহিলিয়াতের চির অবসানকল্পে সংগ্রামের রক্তাক্ত পথে অগ্রসর হয়। বিপরীত দিকে জাহিলিয়াতের (বাতিলের) ধ্বজাধারীরা নিজেদের অস্তীত্ব রক্ষার জন্য জীবনবাজী রেখে জাহিলিয়াতের পক্ষে সংগ্রাম করে। এ সংগ্রাম চিরন্তন, সর্বকালের ও সর্বযুগের। হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যার এ মোকাবেলাকে ভৌগলিক অবস্থান, সময়ের পরিধি, এমনকি রক্ত সম্পর্কের বন্ধনেও বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।

পরিচয়ের মাপকাঠি স্পষ্ট : কে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে, আর কে জাহিলিয়াত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই করে এটাই ধর্তব্য। ইরশাদ হয়েছে–

অর্থ : "যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে, আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের (জাহিলিয়াতের) পথে।"(সূরা নিসা, আয়াত : ৭৬)

আজ বড় প্রয়োজন সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ সৈনিকদের। সময় তাদেরকেই আহ্বান করছে, যারা সকল প্রকার বাতিলের (জাহিলিয়াতের) মোকাবেলায় জীবনের তাজাখুনের বিনিময়ে হলেও আমৃত্যু সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। তাদেরকেই কুরআন আহ্বান করছে, যারা শাহাদাতকেই জীবনের গণিমত মনে করে। অপমানিত জীবনের চেয়ে জান্নাতী মৃত্যুই যাদের প্রিয়; তাদের জীবনাদর্শই হোক মোদের জীবন চলার অনুপ্রেরণা।

ইসলামী হুকুমত কি?

ইসলমী হুকুমত হলো আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধানানুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রকাঠামোর নাম। ইসলামী শরীয়ত তথা কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এ চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠবে, তাকেই ইসলামী হুকুমত বলা হবে। হুকুমতে ইলাহীয়া বা খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার আইন নতুন করে প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্বেই ইসলামী শরীয়াহর বিধান প্রণীত হয়ে আছে। এ আইনে সকল নাগরিক সমান; ধনী-গরীব, বাদশা-ফকির কারও পক্ষেই ইসলামী হুকুমতের আইন পক্ষপাতিত্ব করে না। বিধায় ইসলামী হুকুমতে আইনের শাসন সু-প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী হুকুমতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ বিধায় রাষ্ট্রনায়ক ও আল্লাহর নিকট জবাবদিহীর ভয়ে ভীত থাকেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হুকুমত পরিচালিত হয় শুরায়ী পদ্ধতিতে। এখানে স্বৈরতান্ত্রিকতার কোন সুযোগ নেই। সর্বত্রই জবাবদিহীতা বাধ্যতামূলক। ইসলামী হুকুমতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার উপস্থিতি নিশ্চিত থাকার কারণেই এ হুকুমতের গ্রহণযোগ্যতা সার্বজনীন ও সর্বকালীন।

ইসলামী হুকুমতের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী হুকুমতের বিকল্প নেই। চলমান সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে যে ভারসাম্যহীন অ-ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান, শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পরিবর্তন ব্যতীত এ অবস্থার উন্নয়ন আশা করা যায় না। উল্লিখিত কাঠামোতে সময়ের ধারাবাহিকতায় নেতৃত্ব বা ক্ষমতার হাত বদলের জন্য অনেক খুন ঝরাতে হয়েছে, সীমাহীন ক্ষতিকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে নির্দ্বিধায়; কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয়নি; বরং ক্রমাবনতিই হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী

বাংলাদেশের ইতিহাস তার জ্বলন্ত স্বাক্ষ্য। সমাজ বা রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, শুধু নেতার পরিবর্তনই নয়, মানবতার মুক্তি ও স্থায়ী শান্তির অন্বেষায় একাধিকবার নীতি বা আদর্শের ভিত্তিতে পরিবর্তনের ঘটনাও ঘটেছে। ফরাসী বিপ্লব, কমিউনিজম বিপ্লব, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতি ভৌগলিক ও আদর্শিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে আমরা স্পষ্টতঃই দেখতে পাই, প্রতিটি পট-পরিবর্তনেই ঘটেছে অনেক রক্তপাত, দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সীমাহীন ত্যাগ-কুরবানীর, রচিত হয়েছে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম অধ্যায়। প্রশ্ন থেকে যায়–এতো কিছুর পরও কি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে? মানবতার মুক্তি ও স্থায়ী শান্তি আজও অনিশ্চিত থেকে গেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর জাহিলিয়াত এখনও মুক্তিকামী মানুষকে বন্দীত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ বন্দীত্ব আর অশান্তির চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মানবতা মুক্তি চায়। কিন্তু কিভাবে, কোন পথে মুক্তির সন্ধান মিলবে? বস্তুবাদী তথা মানবগড়া সকল মতবাদ তো একে একে পরীক্ষিত হলো। শুধু ব্যর্থতা আর গ্লানি দিয়েছে, হতাশ করেছে বার বার। তবে কেন মুক্তির নেশায় এ মরিচিকার পেছনে ছুটছে মুক্তিকামীরা? আর কোন মতবাদ, মতাদর্শ আর তন্ত্রমন্ত্র নয়; মুক্তির পথ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। পরীক্ষিত জীবনাদর্শ একটিই, যার মধ্যেই রয়েছে মানবতার মুক্তি ও স্থায়ী শান্তির গ্যারান্টি। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ; সকল কালের সকল যুগের জন্য উপযোগী। এখানেই খুঁজব স্থায়ী শান্তির নীড়; এখানেই রয়েছে মানবতার মুক্তির ঠিকানা।

ইসলামী রাষ্ট্র শান্তির ঠিকানা

ইসলামী রাষ্ট্র আলোকিত জীবনের আবাসন; মানবতার মুক্তির ঠিকানা। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র এর সুফল সকলের জন্য উন্মুক্ত। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এ রাষ্ট্রের সুফল ভোগ করতে পারবে। প্রত্যেক নাগরিকের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত এবং খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান তথা মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বদাই সোচ্চার। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক হলে তাকে সবসময় মনে রাখতে হয়, আমি মহাপরাক্রমশালী রবের বান্দাহ। সর্বদাই আতঙ্কিত থাকতে হয় এজন্য যে, আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা হয় কিনা। আমানতের জিম্মাদারীর ভয় সার্বক্ষণিক তটস্থ রাখে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি নামক একটি গুণই প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরকে দুর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি, আত্মসাৎ, খেয়ানত প্রভৃতি সকল অন্যায় থেকে মুক্ত রাখতে যথেষ্ট। এরই প্রভাবে প্রশাসনিক স্তর হয় স্বচ্ছ ও কলুষমুক্ত। মাটির এ ধরার মানুষগুলো তখন ফেরেশতাদের চেয়ে মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের

আসনে সমাসীন হয়। আইনের শাসন নিশ্চিত হয়; বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদেনা। কোন নীতিকথা নয়, বাস্তব জীবনে পরীক্ষিত যে জীবনাদর্শ, তার কথাই বলছি। তাই তো দেখা যায়, অর্ধজাহানের খলিফা হযরত উমর (রা.)–এর পুত্রকে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেতে হয়েছে। আইনের শাসন নিশ্চিত করতে কাঁপেনি পিতার হৃদয়। পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায়বিচারের এই দৃষ্টান্ত গোটা বিচার শাস্ত্রকে আজও পথ দেখিয়ে দেয়। ইসলামী খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)কে আমরা দেখি একজন সাম্যবাদী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। ন্যায়-ইনসাফ ও সাম্যের পতাকাবাহী ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক উমর (রা.) ভৃত্যকে উটে চড়িয়ে ও নিজে পথপ্রদর্শক হয়ে যে সাম্যতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা শুধু ইসলামী রাষ্ট্রই দিতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্য কোথাও এ বিরল ঘটনার নমুনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সভ্য পৃথিবীতে আজও তো অনেক বনি আদম ক্ষুধার যাতনায় সু-চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মরছে। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর মনে এ বিভৎস চিত্র কি কোন করুণার সৃষ্টি করতে পেরেছে? এ সংবিধান কি পেরেছে ন্যূনতম সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে? অথচ আমরা দেখি, শাসক নিজে কাঁধে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পৌঁছে দেয় ক্ষুধার্ত নাগরিকের ঘরে, রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে খবর নেয় অধিনস্তদের। এসবই সম্ভব হয়েছে সেই নীতি আর আদর্শের জন্য, যা মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জীবন চলার জন্য পাথেয় হিসেবে হাদিয়া দিয়েছেন। জীবন চলার এ পথ নির্দেশনার নাম ইসলাম, যা আজও এ কলুষিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী শান্তির নীড়ে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিশ্বের যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই শন্তির আবাসন তৈরি হয়েছে। ইসলাম পনরশত বছর পূর্বেও যেমনি উপযোগী ছিল, আজও এর উপযোগিতা ন্যূনতম হ্রাস পায়নি। অশান্ত এ বিশ্বব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কোন ভূখণ্ডে যদি আজও ইসলামী জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়; ইসলাম তার স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। জাহিলিয়াতের ধ্বজাধারী বিশ্বমোড়লরা চায়না নিজেদের মোড়লীপনার অবসান, সহ্য করতে পারে না আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত নূরকে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ওদের প্রভূত্ব ও অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। তাই তো ওরা এ শাশ্বত শান্তিময় জীবনব্যবস্থার চিরবিরোধী। ইতিহাস সাক্ষ্য–ইসলামী রাষ্ট্রের সুফলে আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমরাও নিজেদের আবাসস্থল ছেড়ে স্বেচ্ছায় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করেছে।

আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য

আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনেই এ পথ চলার একমাত্র প্রাপ্তি। দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা ও প্রতিকূলতা এ পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে না। জাগতিক ফায়দা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এ পথের যাত্রী হলে–সে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হবে, যন্ত্রণা পাবে এবং মুখ ফিরিয়ে নিবে; লক্ষ্যে পৌঁছা আদৌ সম্ভব হবে না। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পথ চললে সে অফুরন্ত নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে সাথে দুনিয়ার বিজয়ও পাবে।

ইরশাদ হচ্ছে–

অর্থ : "আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতেও বিজয়ের সুসংবাদ।" (সূরা সফ, আয়াত : ১৩)

আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তিই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। এ প্রাপ্তি দুনিয়ার সকল প্রাপ্তিকে নগণ্য করে দেয়। তাই তো সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে জাহিলী সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ আল্লাহর বান্দাহ। দীনে হককে প্রতিষ্ঠিত করার এ অদম্য বাসনা সকল যুগেই বর্তমান। ইরশাদ হচ্ছে–

অর্থ : "তাদেরকেই আল্লাহ মহব্বত করেন; যারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর রাস্তায় (দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে) সংগ্রাম করে।" (সূরা সফ, আয়াত : ৪)

ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রাকে এ পথের সৈনিকেরা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেয়। এ পথকেই তারা নাজাতের পথ হিসেবে বিবেচনা করে। তাই তো ইসলামী বিপ্লবের অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছাত্র আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী লক্ষ্য অর্জনের আমৃত্যু সংগ্রামে অবর্তীর্ণ। কী চাহিদা বা কী কারণ আমাদেরকে এতটা দুঃসাহসী করেছে? কী জন্যই বা আমরা প্রতিষ্ঠিত এ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বের মুখোমুখি অবতীর্ণ হলাম? দুটি কারণ আমাদেরকে বাধ্য করেছে এ পথে অবতীর্ণ হতে। এ কারণদ্বয় অবহেলা করে আমাদের বসে থাকার ন্যূনতম সুযোগটিও নেই। আমরা বাধ্য হয়েছি এ পথে নামতে, নাজাতের এ ডাকে সাড়া দিতে।

যে দুটি কারণ আমাদেরকে নিয়ে এসেছে এ বিপ্লবী কাফেলায়। তা হলো–

১. ব্যক্তি নাজাতের প্রত্যাশা।

২. মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা।

ব্যক্তি নাজাত

ব্যক্তি নাজাত প্রত্যেকেরই প্রত্যাশা। আমরা প্রত্যেকেই চাই জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত আমাদের সকলেরই কাম্য। অথচ গভীরভাবে ভেবে দেখা হয়নি ব্যক্তি নাজাতের জন্য করণীয় কি, আমরা করণীয় সম্পর্কে কতটা সজাগ ও অবগত এবং ব্যক্তি নাজাতের পথে বাঁধাই বা কী?

ব্যক্তি নাজাতের জন্য করণীয়

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদত করার জন্য। আল্লাহপাকের প্রত্যাশা বান্দার পক্ষ থেকে নিরঙ্কুশ গোলামী। আল্লাহপাক নিজকে মালিক বা প্রভু হিসেবে ঘোষণা দিয়ে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

"আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬)‼

কুরআনে কারীমের এ ইবাদত শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। ইবাদতের ব্যাখ্যায় মানুষের সামগ্রিক জীবনের একটি প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। মানুষ তার ব্যক্তিজীবনকে আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে কিভাবে সাজাবে, সমাজকাঠামোকে আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী কিভাবে পরিচালনা করবে, কিভাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা হবে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি কিভাবে আল্লাহর নির্দেশনাকে অনুসরণ করবে; সামগ্রিক বিষয়াবলী কুরআনে কারীম ও রাসূল (স.)–এর জিন্দেগীর মাধ্যমে আমাদেরকে অবগত করানো হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গণে ব্যাপৃত সকল নির্দেশনার বাস্তবায়ন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাহ হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। অতএব, ইবাদতকে শুধু হাতে গোনা কয়েকটি পরিচিত আমলের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কারণেই–এর ব্যাপকতা আমাদের সমাজব্যবস্থায় অপরিচিত হয়ে আছে। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। এ জন্যই ইসলাম পরিপূর্ণ যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহর সবগুলো নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই ইবাদতের

হক আদায় হবে। একজন গোলাম হিসেবে নাজাতের প্রত্যাশা তখনই করা যাবে, যখন প্রভুর ইবাদতে কোন বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

আল্লাহপাকের নিরঙ্কুশ গোলামী বা পরিপূর্ণ ইবাদতের দায়িত্ব পালন করার জন্য জমীনের বুকে খিলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরী। কোন ভূখণ্ডে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে খিলাফতব্যবস্থা বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা হয়। খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে মানবজাতিকে আল্লাহ সুবহানাহু

তা'আলা খলিফা নামে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এজন্যই মানুষের মর্যাদা সকল মাখলুকের চেয়ে বেশি। ইরশাদ হয়েছে–

"(আল্লাহ বলেন) আমি জমীনের বুকে খলিফা বা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে যাচ্ছি।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০)‼

মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে মালিক তার নির্দেশনার পরিপূর্ণতা চাচ্ছেন। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত একজন মুমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্বকে শেষ মনে করতে পারে না। এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে একজন মুমিন ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও পরিপূর্ণ গোলামীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না। মানুষ সমাজের অধীনে বসবাস করে। সমাজ রাষ্ট্রশক্তির অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়। সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বা কানুন ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রীয় সংবিধান আল্লাহর মনোনীত যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে অস্বীকার করে সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অপরদিকে আল্লাহপাক সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবে হোক; সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবনকে কলুষিত করছে। ব্যক্তিজীবনকে আল্লাহর হারাম বা নিষেধকৃত কাজের গণ্ডির বাইরে রাখতে হলে অবশ্যই এমন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন হবে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মূলোৎপাটন করবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে–সংবিধান পরিবর্তন ব্যতীত ব্যক্তিজীবনকেও আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়াবলী থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত রাখা যাচ্ছে না। প্রশ্ন হলো–এজন্য কি ন্যূনতম দুঃখবোধ ও যন্ত্রণা আমাদের মাঝে কাজ করছে? আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হিসেবে সবসময়ই

আমাদের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা। সংবিধান আমাদেরকে বাধ্য করছে ব্যভিচার অধ্যুষিত একটি ভূখণ্ডে বাস করতে। কেননা, এ সংবিধানই আল্লাহর নিষেধকৃত হারামকে অগ্রাহ্য করে ব্যভিচারের লাইসেন্স প্রদানের মতো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেছে। অতএব, যে ভূখণ্ডে আল্লাহর চরম নিষেধকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে বৈধ ঘোষণা করা হচ্ছে–সেখানে একজন মুমিন কতটুকু যন্ত্রণা নিয়ে জমীনের বুকে বেঁচে থাকবে–সেটাই সচেতন বিবেকের প্রশ্ন। এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না, অথচ আমরা নাজাতের প্রত্যাশায় বিভোর। কত বড় মূর্খতায় নিমজ্জিত এ জাতি। দীনকে পরিপূর্ণভাবে না বুঝার কারণে জাতির মধ্যে যে মূর্খতা সৃষ্টি হয়েছে, সে মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন–‼

“তবে কি তোমরা কুরআনের কিছু অংশ মানবে, আর কিছু অংশ মানবে না? যদি এমনটি কর–তাহলে দুনিয়াতেই তোমাদের ওপর নেমে আসবে লাঞ্ছনা ও আখিরাতে রয়েছে অনন্ত আযাব।” (সূরা বাকারা, আয়াত : ৮৫)

ব্যক্তি নাজাতের পথে বাধা

জাহিলী সাংবিধানিক ব্যবস্থায় পরিচালিত রাষ্ট্রকাঠামোই ব্যক্তিনাজাতের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। এ সংবিধান এবং এর অধীনে পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো আল্লাহর নিরঙ্কুশ গোলামীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ কুফরী সংবিধান আল্লাহর প্রভূত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে মানুষের প্রভূ বানিয়েছে। যে সংবিধান মানুষকে মনুষের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করেছে, যে সংবিধান আল্লাহর গোলমীর পথে প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল তুলছে, সে সংবিধান কেন মেনে নিবে আল্লাহর বান্দারা? এ বাঁধার মূলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দারা শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না, বাঁধার এ প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যন্ত্রণার সমাপ্তি আশা করা যায় না। অতএব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। সমাধানের একই পথ, তা হলো সাংবিধানিক পরিবর্তন। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ব্যক্তিনাজাতের পথ পরিস্কার করে নিতে হবে।

মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা

আমরা চাই-প্রতিষ্ঠিত জাহেলী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও ইসলামী হুকুমতের প্রবর্তন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা মানবতাকে বন্দিত্বের শৃংঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে; আর ইসলামী হুকুমত মানবতাকে বন্দিত্বের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি দিবে। মাজলুম মানবতার বন্দিদশা ও এ বন্দিত্ব থেকে মুক্তির পথ নির্দেশিকা দেখতে পাই কুরআনে কারীমে। কুরআন আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলছে, মাজলুমকে জালিমের বন্দিশালা ভেঙ্গে বের করে আনার জন্য; কুরআন আমাদেরকে আহ্বান করছে মাজলুমের বন্ধু সেজে জালিমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য। মানবতার ঘাড়ে বন্দিত্বের শৃঙ্খল চেপে রেখেছে জালিমরা। জালিমের জুলুমের প্রাসাদে আঘাত হানা ব্যতীত মানবতার বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। এসব জালিমদের প্রভুত্বকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে–

“তোমাদের কী হল–কেন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করছ না? অথচ জালিম অধ্যুষিত এ ভূখণ্ডের নির্যাতিত অসহায় নারী, পুরুষ, শিশুরা চিৎকার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে–হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালিমের এ জিন্দান খানা

(জুলুমী শাসনব্যবস্থা) থেকে মুক্তি দাও। আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী (ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব) পাঠাও।” (সূরা নিসা, আয়াত : ৭৫)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে সমাজকাঠামোর বেদনাময় চিত্র, জ্ঞানের পরিধিতে জাগিয়ে তোলে জালিমদের বিভৎসতা, বিবেকের মনিকোঠায় উদ্ভাসিত করে মানবরূপী দানবদের নিষ্ঠুরতম অবিচার। হে তরুণ! আমাদের সমাজকাঠামোতে কি ধর্ষিত মা-বোনদের চিৎকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাইনা? আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কি প্রত্যহ রক্তাক্ত খুনের নির্মমতা প্রকাশ করছে না? অশান্ত বিশ্বে প্রতিনিয়ত জালিমের হিংস্রথাবার শিকার হচ্ছে মাজলুমেরা। অথচ এর কোন বিচার নেই। সমাজকাঠামো, রাষ্ট্রকাঠামো, আন্তর্জাতিক আদালত নির্যাতিত মানবতার পক্ষে কথা বলে না।

দুনিয়ার বিচারব্যবস্থায় জালিম প্রতিনিয়ত প্রশ্রয় পাচ্ছে; আর মাজলুম হচ্ছে বিতাড়িত। অসহায় মাজলুমদের বিচার এ সভ্য (!) পৃথিবীর কোন আদালতে হবে না। এর ফয়সালা একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহর আদালতেই হবে। তাইতো মাজলুম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে মুক্তির প্রত্যাশায়। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য আল্লাহর নিকট অসহনীয়। প্রিয় বান্দাহদের প্রতি মালিকের সতর্ক হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, যার মর্মার্থ হলো–

তোমাদের কী হল? তোমাদের রক্ত কি সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উত্তেজিত হয়না? তোমাদের অনুভূতি কি শেষ হয়ে গেছে? কেন তোমরা নির্যাতিত মানুষদেরকে জালিমের কয়েদখানা থেকে মুক্তির জন্য এগিয়ে আসছ না? কেন তোমরা জাহিলী সমাজব্যবস্থার কবর রচনায় সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছ না?

এ ধমক মুক্তিকামী মানুষের ধমনীতে স্পন্দন তৈরি করে। আল্লাহর রাজত্ব কায়েমে তারা মুখোমুখি হয় বতিলের। একজন বিপ্লবী চিন্তা করে–বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আজ বন্দিত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, শোষণের সমাজতন্ত্র, স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি নামে বস্তুবাদ বিশ্বমানবতাকে বন্দিত্বের অক্টোপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। তইতো সকল প্রকার জাহিলিয়াত ও বন্দিত্ব থেকে নিজেকে এবং বিশ্বমানবতাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইশা ছাত্র আন্দোলনের আবির্ভাব। ছাত্র আন্দোলন প্রস্তুতি নিচ্ছে এক অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের। সে সংগ্রাম হবে মিথ্যার মূলোৎপাটনে সত্যের সংগ্রাম। জাহিলিয়াতের কবর রচনায় ইসলামী বিপ্লবের নিবেদিত প্রাণ সৈনিকের আমৃত্যু সংগ্রাম।

প্রস্তুতি পর্ব : আল্লাহ তা'আলা কুরআনপাকে জাহিলী সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী বিপ্লবের সৈনিকদেরকে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। প্রস্তুতি

পর্বের মহড়া এতটাই মজবুত হওয়া শর্ত, যাতে শত্রুর (বাতিলের) মনে ভীতির সঞ্চার হয়। আল্লাহ বলেন–

"তোমরা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চার (প্রস্তুতিগ্রহণ) করো এবং যুদ্ধাপযোগী ঘোড়া (প্রয়োজনীয় আসবাব) প্রস্তুত রাখো, যাতে তোমাদের প্রস্তুতি দেখে তোমাদের শত্রুরা সংকিত ও ভীত থাকে।" (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬০)

জাহিলী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য ছাত্র আন্দোলন ধারাবাহিক প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করছে। পাঁচদফা কর্মসূচীর আলোকে সম্পন্ন হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতি পর্ব।

ক. ইলম ও তারবিয়াত (জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ)

জ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন ফরজ করে দিয়েছেন। আখিরাতের মুক্তি নির্ভর করে আমলের ওপর। আর সঠিক জ্ঞান ছাড়া আমল করা যায় না। শুধু জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়, জ্ঞান যথাযথভাবে কার্যকর করার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই জন্যই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে সঠিক জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণকে প্রথম দফা কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

খ. আমল ও তাযকিয়াহ (আত্মশুদ্ধি)

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন রূহানিয়াত ও জিহাদের একটি সমন্বিত প্রয়াস। এ আন্দোলনের সকল কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্যক্তিজীবনকে ইসলামের সঠিক নমুনায় গড়ে তোলার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। সত্যিকার অর্থে যারা ব্যক্তিজীবনে ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধানকে মেনে চলতে পারে না, তাদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। নিজের আমল পরিশুদ্ধ ও নফসকে পবিত্র করার চেষ্টা না করে শুধু সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দেওয়া মোনাফেকী ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ. তাবলীগ (দাওয়াত)

ইলম ও আমলের পরই তৃতীয় দফা কর্মসূচী হিসেবে তাবলীগ বা দাওয়াতকে নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল প্রকার খোদাদ্রোহী তাগুতী মত ও পথ অস্বীকার করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহতা'আলার সার্বভৌমত্ব ও রাসূলুল্লাহ (স.)–এর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান করাই এ কর্মসূচীর চাহিদা। সে লক্ষ্যে একজন ছাত্রকে জাহিলিয়াত, অপসংস্কৃতি ও খোদাদ্রোহী সকল মতবাদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি,

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারি হিসেবে গঠনের মাধ্যমে একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত করতে ছাত্র আন্দোলন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দাওয়াত মৌলিকভাবে চারটি বিষয়ের উপরে হবে।

(ক) ঈমানের দাওয়াত (খ) ইলমের দাওয়াত (গ) আমলের দাওয়াত (ঘ) সমাজ পরিবর্তনের দাওয়াত

ঘ. তানজীম (সংগঠন)

যেকোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আন্দোলন করা যায় না। তাই আন্দোলনের জন্য সংগঠন অপরিহার্য। যারা ব্যক্তিজীবনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও সমাজের সর্বস্তরে তা বাস্তবায়নের সংগ্রামের স্বতঃস্ফুর্তভাবে শরীক হতে প্রস্তুত, তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করে লক্ষ্য পাণে অগ্রসর হওয়াই এ কর্মসূচীর দাবি।

ঙ. ইনকিলাব (সামাজবিপ্লব)

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের পঞ্চম ও চূড়ান্ত দফা কর্মসূচী হলো ইনকিলাব বা সমাজবিপ্লব। আদর্শের পক্ষে উপরোক্ত চারটি কর্মসূচীর ধারাবাহিকতায় গণবিপ্লবের পথ পরিক্রমায় প্রচলিত জাহিলী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের পথ চলার নীতি

এটা নিশ্চিত যে, আমাদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; কন্টকাকীর্ণ। এ পথের যাত্রা শুরু হয় নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপরে সোপর্দ করার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে। এ পথে অপেক্ষারত আছে উপহাস, নির্যাতন, জেল-জুলুম আর ত্যাগের চাহিদা। এখানে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়, ভোগের আশা করা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত অধিপতিদের মোকাবেলা করে দৃঢ় পদক্ষেপে এ পথ অগ্রসর হতে হয়। এ পথে থাকে বাঁধার প্রাচীর–যা কিনা তাজা খুন ব্যতীত অপসারিত হয় না। এ পথকে নিতে হয় জীবনের চেয়েও আপন করে। পথের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনে পেছনে নজর করলে শুধু শহীদের রক্ত আর লাশ নজরে পড়বে। জালিমের রক্তপিপাসা মিটিয়েই এ পথে বিজয় আসবে। এ পথে বিজয় আছে; নেই বিজয়োল্লাস। আছে শুধু আল্লাহর ভয়, রোনাজারী ও পরকালের জবাবদিহীতার অনুভূতি।

এ পথে জাহিলিয়াতের সাথে কোন রকম আপস নেই, আছে শুধু আদর্শের ওপর মজবুতি। দুনিয়ার সকল শক্তি শত্রুতে পরিণত হলেও, সকল বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হলেও এ পথের অবিচল সৈনিক ঘাবড়াতে পারে না; নিজের দায়িত্ব থেকে মুখ

ফিরিয়ে নিতে পারে না। আল্লাহর পথের সৈনিক বিপ্লবী এ চিন্তার বিপরীতে কোন যুক্তিই গ্রহণ করতে পারে না। মেনে নিতে পারে না অন্যকোন দৃষ্টান্ত। এ পথ চিরন্তন, এ পথ শাশ্বত, এ পথ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। রাসূল (স.)−এর জীবনাদর্শ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)−এর জিন্দেগী আমাদের সামনে সে পথের নমুনা রেখে গেছে। তাইতো আমাদের পথ চলা।

সমাজ পরিবর্তনের পথ ও পদ্ধতি

আমরা চাই সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন। আর এর জন্য সাংবিধানিক পরিবর্তন শর্ত। সমাজ পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। ইচ্ছা করলেই বা কিছু জনগোষ্ঠি একত্রিত হয়ে চাইলেই এ পরিবর্তন সংগঠিত হয়ে যাবে না। এর জন্য ধারাবাহিক দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়, গ্রহণ করতে হয় প্রয়োজনীয় কৌশল, অবলম্বন করতে হয় সময়োপযোগী কর্মপদ্ধতি।

হাদীস শরীফে এ পথ চলার কৌশল ও পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে পরিস্কারভাবে। ইরশাদ হচ্ছে−

"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত দেখে, সেযেন তার হাত দ্বারা (বাহুশক্তি প্রয়োগ করে) অন্যায়ের উৎসমূল বন্ধ করে দেয়। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা (বাকশক্তি প্রয়োগে) অন্যায়ের মূলোৎপাটন করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্যায়ের চির অবসানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আর এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে জিহাদের তিনটি স্তর বর্ণনা করে, সময়োপযোগী কৌশল প্রয়োগের নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। বাহুশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের মূলোৎপাটনকে সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। হাদীসের বর্ণনা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, বাহুশক্তি প্রয়োগ হলো প্রস্তুতির সর্বোচ্চ ব্যবহার। উক্ত হাদীসের বর্ণনা মতে প্রস্তুতি গ্রহণ ও শক্তি প্রয়োগের ধারাবাহিকতা অবশ্যই থাকতে হবে। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের মজবুতি অর্জন ব্যতীত সর্বোচ্চ স্তরের আমল কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রথমত এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে আদর্শের পক্ষে সার্বজনীন জনমত তৈরি হয় ও কাঙ্ক্ষিত কর্মীবাহিনী গড়ে ওঠে। কোন আদর্শকে একটি ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বশর্ত হলো আদর্শের সুফলতা ও প্রয়োজনীয়তা সে ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীকে বুঝার সুযোগ দিতে হবে। সার্বজনীন দাওয়াতের মাধ্যমে আদর্শের পক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং সময়ের ধারাবাহিকতায় এ চেতনা গণদাবিতে রূপান্তরিত হবে। সমাজবিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে ইসলামী হুকুমতের দাবি গণঅভ্যুত্থানের পরিবেশ তৈরি করবে। সর্বশেষ পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের ফলাফলকে ধরে রাখতে এবং শান্তিকামী-

মুক্তিকামী মানবতার জন্য ইসলামী হুকুমতের অবারিত নিয়ামতকে নিশ্চিত করার স্বার্থে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। সমাজবিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে−এ পর্যন্ত চারটি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে
বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এর মধ্যে কোনটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া ও কোনটি অপূর্ণাঙ্গ। আবার কোনটি ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত ও কোনটি বস্তুবাদের সৃষ্ট কৌশল। আলোচনায় চারটি প্রক্রিয়ায় বর্ণনা ও আমাদের পথ চলার নীতি উল্লেখ করা হলো। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার মধ্যে সঠিক, সময়োপযোগী ও কার্যকরী প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি। অর্থাৎ ইসলামী সমাজবিপ্লবের কৌশল অবলম্বনে রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শই মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।

১. নির্বাচন প্রক্রিয়া

গণতন্ত্র ও নির্বাচন এক-অভিন্ন নয়। গণতন্ত্র একটি মতবাদ বা জীবনাদর্শ; আর নির্বাচন হলো জনমত বা জনগোষ্ঠীর রায় সংগ্রহের একটি প্রক্রিয়া। ইসলামী শরীয়তে ও জনমত বা ব্যক্তিগত মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া স্বীকৃত। খোলাফায়ে রাশেদার নির্বাচন বা মনোনয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে মতামত সংগ্রহের দলীল পরিলক্ষিত হয়। চার খলিফার নির্বাচন বা মনোনয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। যেকোন প্রক্রিয়াই উম্মতের জন্য গ্রহণযোগ্য। তবে বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে খোলাফায়ে রাশেদার নির্বাচন প্রক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রযেছে। খোলাফায়ে রাশেদার মনোনয় প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টতঃই অবগত হতে পারি যে, সে প্রেক্ষাপটে দীনে হক (ইসলাম) গালিব (বিজয়ী) ছিল। খেলাফতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে নতুন খলিফা নির্বাচন বা মনোনয়নের প্রক্রিয়া হবে খোলাফায়ে রাশেদার প্রবর্তিত প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্তমান সমাজ, রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কাঠামোতে দীনে হক বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত নেই; পরাজিত। এ অবস্থায় দীনকে গালিব করার জন্য সমাজবিপ্লবের ধারাবাহিক পথে। অগ্রসর হতে হবে, যে পথে রাসূল (স.) দীনকে গালিব করেছেন। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় সৃষ্ট একটি প্রক্রিয়ার নাম। গধলড়ৎরঃ সঁংঃ নব মৎধহঃবফ অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যের রায়ই গ্রহণযোগ্য−এ হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার দর্শন। এ প্রক্রিয়ায় সংখ্যাধিক্যের রায়ের মাধ্যমে যদি অন্যায়ও গৃহিত হয়, সকল জনগোষ্ঠী তা মেনে নিতে বাধ্য। এ অন্যায় প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতা কোন সুন্দর
ফলাফল বয়ে আনতে পারে না। সঙ্গত কারণেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা সরকার কাঠামো দেশ পরিচালনায় বার বার ব্যর্থ হচ্ছে।

অতএব নির্বাচন প্রক্রিয়া ইসলামী বিপ্লবের চূড়ান্ত পন্থা হিসেবে গৃহিত হতে পারে না। ইসলামী বিপ্লব একটি সামগ্রিক পরিবর্তনের দর্শন−যা প্রচলিত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্ভব

নয়। এ প্রক্রিয়ায় সংবিধানের আংশিক পরবর্তন সম্ভব হলেও সামগ্রিক পরিবর্তন অকল্পনীয় বা বিরল। অধিকন্তু প্রচলিত নির্বাচনের ভিত্তি হলো অবৈধ অর্থ, অবৈধ অস্ত্র, ও মিথ্যা-প্রতারণা, যার মাধ্যমে কোন সৎ ও সুন্দর মানসিকতা সম্পন্ন প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া খুবই কঠিন। তাইতো দেখা যায়–জাতীয় প্রতিনিধিত্বের অধিকাংশই দুর্নীতিবাজ, প্রতারক, সন্ত্রাসী ও অসৎ হয়ে থাকে, যাদের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের আশা করা নিতান্তই বোকামী। পক্ষান্তরে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে পার্থিব জান্নাত, যেখানে সকল নাগরিক মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা পাবে, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত থাকবে, প্রতারণা-সন্ত্রাস দুর্নীতির মূলোৎপাটন হবে। অতএব, এমন একটি সুন্দরতম কাঠামো অসুন্দর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদৌ তৈরি হতে পারে না। তাই গণতান্ত্রিক নির্বাচন বা ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইসলামী সমাজবিপ্লব সম্ভব নয়। এ প্রক্রিয়া ইসলামী সমাজবিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও চাহিদাকে কোনদিনও পূরণ করতে সক্ষম হবে না। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রস্তুতির সহায়ক হতে পারে।

একটি প্রশ্নের জবাব

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইসলামী বিপ্লব সম্ভব না হলে কেন আমরা এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছি? জবাব হলো, নির্বাচন আমাদের চলার পথ নয়। ইসলামী জীবনাদর্শকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে নির্বাচনকে আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। এর গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক তুলে ধরা হলো–

ক) দেশের মানুষ নির্বাচনমুখি। নির্বাচনের সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল সংগঠনের প্রতি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কেউ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার মুক্তির পথ বিবেচনা করে, কেউ
সমাজতন্ত্রের সাম্যবাদের কথা বলে, আবার কেউ ধর্মীয় রাজনীতিকে নিশ্চিহ্ন করতে জোরালো বক্তব্য রাখে। অর্থাৎ সকলেই নবতর উদ্যোমে এ মৌসুমে নিজ নিজ দলীয় আদর্শ; মতবাদ ও চিন্তাধারা প্রচারে তৎপর থাকে। ধর্মহীন রাজনীতির প্রাধান্য ও ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর অপূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকার কারণে সার্বজনীন ইসলামী জীবনাদর্শ এ ভূখণ্ডে পরাজিত অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থার উন্নতি ও ইসলামী জীবনাদর্শের গ্রহণযোগ্যতা দেশের জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় ও মন-মগজে স্থায়ী করার জন্য নির্বাচনের মৌসুমকে বর্তমান জাহিলী সামজব্যবস্থার আদর্শ প্রচারের একটি সময়োপযোগী কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। নির্বাচনকে অবলম্বন করে আমরা আমাদের আদর্শ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে চাই এবং কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আমাদের চিন্তাধারার সাথে সংঘবদ্ধ করতে চাই। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্বাচন আমাদের আদর্শ প্রচারের একটি সাময়িক

কৌশল মাত্র। আদর্শকে ব্যাপকভাবে প্রচার এবং আদর্শের পক্ষে জনমত গঠন ও জনমত নিরীক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব সৃষ্টি ও শক্তির প্রদর্শনই আমাদের এ কৌশলের মূল লক্ষ্য।

খ) নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোট প্রদানের মাধ্যমে নিজের মতামত বা রায় প্রদান করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভোট প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করা হয়, যারা জাতীয় আইন রচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে ভোট হলো সমর্থন দেওয়া বা সাক্ষ্য দেওয়া। ভোটের মাধ্যমে একজন মুমিন তার ঈমানের হেফাযত করতে পারে। বস্তুবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী এ মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বশীল কোন ব্যক্তিকে ভোটপ্রদান করার অর্থ হলো তার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমর্থন দেওয়া। যে মতবাদ আল্লাহর প্রভুত্বের সাথে সাংঘর্ষিকতা সৃষ্টি করে অথবা আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে, সে মতবাদ প্রতিষ্ঠার সমর্থন দেওয়া হলে সেটা প্রকারান্তরে কুফর ও শিরককেই সমর্থন দেওয়া হবে। সে দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই উলামায়ে কেরামের ফতোয়া হলো–মতবাদী ব্যবস্থার বিশ্বাসীদল বা ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করলে মুমিনের ঈমান চলে যাবে। অতএব, মুমিনের ঈমানের হিফাযতের জন্য ইসলামী জীবনাদর্শের পক্ষে জনমত সংগ্রহের লক্ষ্যে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকি।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের অভিমত

প্রচলিত পার্লামেন্টারী নির্বাচন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে জায়েয না জায়েযের বিতর্ক অবসানকল্পে সমকালীন বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী অভিমত ও ফতোয়া নিম্নে তুলে ধরা হলো–

হযরত মাও. মুফতী শফী (রহ.)–এর অভিমত

উপমহাদেশের অন্যতম মুফাচ্ছিরে কুরআন, বিশিষ্ট আলেমেদীন হযরত মাও. মুফতী শফী (রহ.) প্রচলিত জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটদান প্রসঙ্গে মা'আরিফুল কুরআনে সূরা মায়েদার ৮নং আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন। ভোটেন তিনটি দিক রয়েছে। যথা : ১) সাক্ষ্যদান ২) সুপারিশ করা ৩) ওকালতি করা।

ভোটদানের পূর্বে ভোটদাতাকে দেখতে হবে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখেন কিনা এবং সে সৎ ও আল্লাহভীরু কিনা। ভোটপ্রদানের পূর্বে এ দুটি শর্ত যাচাই করে দেখা প্রত্যেক মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। আর এ ব্যাপারে শৈথিল্য ও উদাসীনতা প্রদর্শিত হলে গুনাহের ভাগী হবে। আল্লাহভীরু, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমনি বিরাট ছাওয়াবের কাজ; একইভাবে অযোগ্য, অসৎ ও অধর্মপরায়ন ব্যক্তিকে ভোটদান মিথ্যাসাক্ষ্য, মন্দ সুপারিশ ও অবৈধ ওকালতি

হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মারাত্মক ফলাফল ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনপাকে ইরশাদ হচ্ছে–
অর্থ : "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে।" (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৮)।"
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী (রহ.) বলেন–প্রচলিত অর্থে শাহাদাত বা সক্ষ্যদান দ্বারা মামলা-মোকদ্দমার বিচারকের সামনে সাক্ষ্যদানকে বুঝায়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় শহাদাত শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন রোগের সত্যতার জন্য রোগী সম্পর্কে ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রদান ও শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হলে পাশের সার্টিফিকেট প্রদান সাক্ষ্যদানের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে আইনসভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও একপ্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে এ সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, প্রার্থী ব্যক্তিগত সততা, যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।
সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে কুরআনেপাকে আরও ইরশাদ হচ্ছে–
অর্থ : "সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৩)
উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠিন গুনাহ।
কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় দিক হচ্ছে শাফায়াত বা সুপারিশ করা। ভোট প্রদানের মাধ্যমে ভোটদাতা ব্যক্তি সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। এ প্রসঙ্গে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত হলো–
"অর্থাৎ : যে ব্যক্তি উত্তম ও সৎ সুপারিশ করবে, যার জন্য সুপারিশ করে, তাকে তার পূণ্য থেকে অংশ দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।" (সূরা নিসা, আয়াত : ৮৫)
উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভোটপ্রদানের ফলশ্রুতিতে প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব নেক আমল করবে, ভোটদাতা তার অংশ পাবে। একইভাবে প্রার্থী যেসব ভ্রান্তি ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।
শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, যার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপ ভোট দাতার কাঁধে চেপে বসবে।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এর অভিমত
মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) "ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ" গ্রন্থে বলেন–ভোট শব্দের শাব্দিক অর্থ মতামত প্রদান বা রায় প্রকাশ। পারিভাষিক অর্থে–ভোট দেওয়া বলতে বুঝায় কাউকে সততা, বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের পদের জন্য সমর্থন করা।
আল্লাহভীরু, সৎ ও যোগ্য লোককে ভোট প্রদানের গুরুত্ব প্রদানপূর্বক হযরত বলেন–যদি ইসলাম ও দেশের নাগরিকদের ন্যায্য দাবি পেশ করার জন্য বিশ্বস্ত-যোগ্য লোক পাওয়া যায় এবং সে যদি অনৈসলামিক দলভুক্ত না হয়, তাহলে তাকে প্রতিনিধিত্বের পদে ভোট দেওয়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে হযরত আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যদি ইসলামী শরীয়তের আলোকে প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে ভোট দান থেকে বিরত থাকা উচিত। ইসলামী শরীয়তের বিপরীতে ভোটপ্রদান করলে জালিমের সহায়তা করা হবে এবং ভোট দানকারী ব্যক্তি পাপের অংশীদার হবে।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম ও গুনাহে কবীরা। জালিম, অযোগ্য, অসৎ অবিশ্বস্ত ও দুনিয়াদারকে সৎ, যোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে সাক্ষ্য দেওয়া মিথ্যা সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। যদি কোন ভোটার অসৎ, অযোগ্য ও দুনিয়াদার প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্বের পদে রায় দেয়, তাহলে কঠিন গুনাহ হবে এবং এরূপ ভোট প্রদান হারাম।
এ প্রসঙ্গে হযরত জাতিকে সতর্ক করে বলেন–ভোট পবিত্র আমানত। অতএব এ আমানত ইসলামী শরীয়তের বিপরীতে প্রয়োগ হলে তা প্রকারান্তরে শরীয়তের আইনকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)–এর অভিমত
সৌদি আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.)কে প্রচলিত পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেন–যেসব দেশ আল্লাহপ্রদত্ত শরয়ী বিধান দ্বারা পরিচালিত নয়, সেসব দেশের প্রতিনিধি সভা ও পার্লামেন্টে প্রবেশ এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে উলামা ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অংশগ্রহণ জায়েয; তবে বিপজ্জনক। কোন ব্যক্তি যদি ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, মানুষকে কল্যাণ কর্মের দিকে আকৃষ্ট করা এবং বাতিল প্রতিরোধ করার নিয়তে পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে আইন সভায় প্রবেশ করে, তাতে আমি ক্ষতির কিছু দেখি না। কারণ, এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য পার্থিব লোভ কিংবা অর্থ নয়; বরং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্য-ন্যায়ের পক্ষে বাতিলের মোকাবেলায় সংগ্রাম করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি ত্রুটিমুক্ত হয়, তাহলে এরূপ করাটাই বরং কর্তব্য। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে এবং বাতিলের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে কোন পার্লামেন্টারিয়ান যদি শরীয়তের বিধি-বিধান

কার্যকর করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন। আর যদি এ কাজের মধ্যে পার্থিব লোভ ও তাগুত শাসকগোষ্ঠীর গোলামী প্রকাশ পায়, তাহলে তা জায়েয হবে না। সুতরাং সকল কাজের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) -এর তাওবার ডাক

দেশবরেণ্য বুজুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) নিজেই বাতিলের মোকাবেলায় হকের আওয়াজকে বুলন্দ করতে তাওবার ডাক নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাতির উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন–জাতি এতদিন তাগুত শক্তির পক্ষে ভোট দিয়ে গুনাহগার হয়েছে। অতএব, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সময়ের দাবি। হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি টেনে হযরত জোরালো কণ্ঠে বলেছেন–গুনাহ যে সুরতে হবে, তাওবাও সে একই সুরতে হতে হবে। জাতি গুনাহগার হয়েছে বাতিলকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে। এজন্য জাতিকে তাওবা করতে হবে

বাতিলের বিপক্ষে ভোটযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। হযরত হাফেজ্জী হজুর (রহ.)-এর সমকালীন আহ্বান গোটা জাতির মাঝে এক নতুন চেতনা সৃষ্টি করেছিল। সকল উলামায়ে কেরাম তাঁর অনুসারী হয়ে ভোটের জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। ‼

সেজন্যই হযরতের ভোটযুদ্ধকে তাওবার ডাক হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমকালীন দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম ভোটের জিহাদ অব্যাহত রেখেছেন।

২. সামরিক অভ্যুখান

কোন ভূখণ্ডে সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ক্ষমতা দখলকেই সামরিক অভ্যুত্থান বলা হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ক্ষমতার পট-পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু স্থায়িত্ব পায়নি। কেননা, অস্ত্রের মুখে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থা সার্বজনীন হতে পারে না। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত শাসনব্যবস্থা যেহেতু সার্বজনীন হতে হবে ও স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে, সেহেতু এ প্রক্রিয়ায় ইসলামী বিপ্লব কাম্য হতে পারে না। অধিকন্তু সশস্ত্র বাহিনীতে প্রণীত বিধানাবলী সেনা সদস্যদেরকে নৈতিকভাবে গড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট সহায়ক নয়; বরং ডরহব ধহফ ডড়সবহ গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ থেকে গেছে, যা চরিত্র বিধ্বংসী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট।

ইসলামী বিপ্লব প্রকৃত পক্ষেই একটি নৈতিক বিপ্লব। অতএব, এ বিপ্লবে নেতৃত্ব দানকারী জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত নীতি ও গুণাবলীর আলোকে নিজ চরিত্র গঠন করতে হবে। ব্যক্তি গঠনের এ প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অথবা

বর্তমান জাহিলী সংবিধানের অধীনে পরিচালিত সামরিক জীবন-যাপনের বন্ধনে আদৌ সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলনের প্রণীত কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির আলোকেই ইসলামী সমাজবিপ্লবের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে এবং এদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত পরিচালিত হবে। এর ব্যতিক্রম হলে ইসলামী হুকুমত প্রাপ্তির কল্পনা করাও সমীচীন হবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য : সামরিক অভ্যুত্থান কোনকালেই ইসলামী হুকুমতকে প্রতিষ্ঠিত করেনি।

৩. সশস্ত্রবিপ্লব‼

ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থায় জিহাদ ইকটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতের নাম। জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের যে অপপ্রচার রয়েছে, সেটা নিতান্তই পরিকল্পিত মিথ্যাবাজী। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি ফরজ ইবাদতের ন্যায় ইসলামী জীবনাদর্শে জিহাদও একটি ফরজ ইবাদত, যা জাহিলিয়াতের অবসান ঘটিয়ে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো বিনির্মাণের একমাত্র হাতিয়ার। জিহাদকে ক্যান্সার নিরাময়ের হাতিয়ার হিসেবে তুলনা করা যায়। ক্যান্সারের রোগীকে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে ডাক্তার রোগীর গোটা শরীরকে আরোগ্যতা দান করে। তাই বলে ডাক্তারকে ডাকাত ভাবা ঠিক হবে কি? সুস্থ শরীর ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ডাক্তারকে অস্ত্রপচারের মতো নির্দয় কাজে হাত দিতে হয়েছে। আমাদের সমাজব্যবস্থা একটি শরীরতুল্য, যেখানে কুফর-শিরক ক্যান্সারের জীবানুতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এবং যার দ্বারা প্রতি মুহূর্তে গোটা সমাজব্যবস্থা কলুষিত হচ্ছে। সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংসাত্মক এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য একজন মুমিন ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে গোটা সমাজকাঠামোর জন্য উপকারই হবে বটে। এতে সমাজকাঠামো নতুনভাবে গড়ার সুযোগ পাবে। যদি কোন সংঘবদ্ধ শক্তি ইসলামী শরীয়তের নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক কুফর শিরক ও নিফাকের মূলোৎপাটন করে শান্তিময় সমাজকাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে এ প্রক্রিয়াকে সশস্ত্র জিহাদ বলা হবে। সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত বিপ্লবকে সশস্ত্রবিপ্লব বলা হয়। সশস্ত্রবিপ্লবের এ পথ কোন ভূখণ্ডে মুক্তিকামী মানবতার চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এ পথ ফাসাদ সৃষ্টি করে না; বরং সমাজকাঠামোকে স্থায়ী ফাসাদ থেকে মুক্ত করে। এ পথ কোন ব্যক্তির একক কল্পনাপ্রসূত মানসিকতাকে সমর্থন করে না; বরং সার্বজনীনতার ভিত্তিতে রচিত হয়। জিহাদ যেহেতু ইসলামী জীবনব্যবস্থার একটি মর্যাদাপূর্ণ ফরজ ইবাদত, সেহেতু জিহাদের সকল পর্যায়গুলো ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় মাসআলা অনুযায়ী হতে হবে। সশস্ত্র জিহাদের পূর্বশর্ত সার্বজনীন দাওয়াত।

সার্বজনীন দাওয়াতের মাধ্যমে কুফর ও ঈমান স্পষ্টভাবে পৃথক হবে, ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে সকল জনগোষ্ঠী পূর্ণভাবে অবগত হবে। ঈমান ও কুফরকে সুস্পষ্টভাবে জেনে যদি কোন জনগোষ্ঠী কুফরের পক্ষ নেয়, ঈমানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করে, তখন সর্বোচ্চ উলামায়ে কেরামের (Scholar of Islamic Ideology) ঐক্যমতের ভিত্তিতে সশস্ত্র জিহাদের ডাক আসে। এর পূর্বে প্রস্তুতিমূলক জিহাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন জাহিলী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ প্রস্তুতি হলো আদর্শকে সার্বজনীন, গণমুখি ও বিজয়ী করার দাওয়াত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যেসব কারণে সর্বোচ্চ উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণাকে এখনো উপযোগী মনে করা হচ্ছে না তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ তুলে ধরা হলো :

ক) আদর্শ প্রচারের দুর্বলতা

ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ কর্মীবাহিনী এখন পর্যন্ত এ ভূখণ্ডের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামের প্রকৃত অবস্থাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। বিধায় ধর্মভীরু অনেক মুসলমানই ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ হিসেবে জানা ও মানার সুযোগ পায়নি। যেমন অনেক মুসল্লী রয়েছেন, যারা নিয়মিত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামের ফরজিয়াত পালন করছেন এবং সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফলের আমলেও অভ্যস্ত। কিন্তু দীন (ইসলাম) বিজয়ের জন্য কোন চিন্তাই করেন না; অথবা করলেও গুরুত্বহীনভাবে করছেন। অথচ রাসূল (স.)-এর জিন্দেগীকে বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হয়, দীনে হক্বকে (ইসলাম) সকল মতবাদ বা মতাদর্শের ওপরে বিজয়ী করার মধ্য দিয়েই আল্লাহপাক রাসূল (স.)-এর বিপ্লবী জিন্দেগীর সমাপ্তি টেনেছেন, ইলামের পরিপূর্ণতা ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

অর্থ : "রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে এ জন্যই যে, তিনি সকল মতবাদের ওপরে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন। এতে মুশরিকগণ (মানবরচিত মতবাদের ধ্বজাধারীরা) যতই অসন্তুষ্ট হোক।" (সূরা ছফ, আয়াত : ৯)

আজ বর্তমান প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হবে যে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইসলামকে কিছু ধর্মীয় আচরণ যেমন মসজিদ, মাদরাসা, বিবাহ, তালাক, জানাযা প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে চিন্তা করে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথা রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতিতে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা রয়েছে, সে ব্যাপারে অনেকেরই জানা নেই। জানা থাকলেও স্বচ্ছ

বিশ্বাস নেই অথবা মানার মত মানসিকতা নেই। অতএব, চাই সার্বজনীন দাওয়াত। আদর্শের পক্ষে দওয়াতের মাধ্যমে আদর্শের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে হবে। তাহলেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আদর্শকে জানা ও মানার সুযোগ পাবে। সার্বজনীন দাওয়াত ও বিপ্লবী কর্মসূচীর মাধ্যমে ঈমান ও কুফর সুস্পষ্ট হবে এবং ইসলামী গণজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

খ) আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

আন্তর্জাতিক পরাশক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করছে। এরা চায় না, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক; নিজেদের প্রভুত্ব শেষ হয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম হোক। তাই বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের জাগরণকে এরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি নেতিবাচক অপপ্রচার ও ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সকল প্রচেষ্টাকে সমূলে বিনাশ করতে সদা তৎপর। মিডিয়ার একচেটিয়া প্রাধান্য ও বিভিন্ন নামে ষড়যন্ত্রের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক স্থাপিত থাকাতে এ কাজটি তাদের জন্য খুবই সহজ। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অথবা নিজেরাই পরিকল্পিত নাটক সাজিয়ে ইসলামী শক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সারাবিশ্ব থেকে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন নিশ্চিহ্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র কুফর শক্তি প্রতিনিয়তই করে যাচ্ছে। এ অবস্থাতে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে

নিবেদিত প্রাণ কর্মীদেরকে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে এবং কর্মকৌশল ও কর্মসূচী সে আলোকেই প্রণয়ন করতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা কর্মীবাহিনীকে গভীরভাবে স্মরণ রাখতে হবে, অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হতে পারে, এরকম সকল সম্ভাবনা থেকে বেঁচে থেকে সময়োপযোগী কার্যক্রম পরিচালনা করাটাই যুক্তি সঙ্গত। আন্তর্জাতিক কুফর শক্তির পর্যবেক্ষণ দৃষ্টিকে ধোঁকা দিয়ে সকল কার্যক্রম পরিচালনা অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়ক হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো মিডিয়া, এনজিও, অর্থনৈতিক প্রভাব, সামরিক শক্তি অর্জন প্রভৃতি পথ অবলম্বন করে ইসলাম ধ্বংসের অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে; সে পথ বন্ধ করে দেওয়ার যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করতে পারলে শত্রুর শক্তির মধ্যে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

মনে রাখতে হবে, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সার্বিক প্রেক্ষাপট উপযোগী না হলে সশস্ত্রবিপ্লবের নামে যেকোন ধরনের প্রচেষ্টা অদূরদর্শী চিন্তা ও ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থি কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। এসকল অপরিণামদর্শী কার্মকাণ্ড ইসলামী আন্দোলনের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে

ইসলামী আন্দোলনের অস্তিত্বকেও নিশ্চিহ্ন করার কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গ) ভৌগলিক অবস্থান

আমরা বাংলাদেশ নামক মুসলিম অধ্যুষিত ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডের বাসিন্দা, ভৌগলিক মানচিত্রে যার তিনদিক ভারত বেষ্টিত ও একদিকে বঙ্গোপসাগর। দেশের অভ্যন্তরভাগ ভারতের 'র' এবং আমেরিকার সিআইএ-এর তথ্য সরবরাহের জন্য মোটেই প্রতিকুল নয়। যেকোন ধরনের সহযোগিতা অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা দুটি দিকই ভারতের পক্ষ থেকে বেশি আশা করা যায়। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি কোন সময়েই এদেশের মুসলমান, মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে ছিল না। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও
ইহুদীবাদদের চর 'র' এবং সিআইএ সবসময়ই ব্যস্ত থাকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম বা আন্দোলনের ন্যূনতম অস্তিত্বকেও মিটিয়ে দিতে। অপরপক্ষে, সমতল এ ভূখণ্ডের বিরোধী শিবিরের যেকোন আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট প্রতিরোধশক্তি সম্পন্ন নয়। অধিকন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। সার্বিক বিচারে দেশের ভৌগলিক অবস্থা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। এ অবস্থাতে যেকোন কর্মসূচীর সফলতা দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের মধ্যেই নির্ভর করছে। তাই বাস্তবতাবিবর্জিত কোন কর্মসূচী নিতান্তই বোকামী হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৪. গণবিপ্লব

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলকে গণবিপ্লব বলা হয়। অর্থাৎ কোন ভূখণ্ডে আদর্শের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীকে (পর্যাপ্ত নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী) সংগঠিত ও প্রস্তুত করে এবং অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে কোন সংগঠন সর্বাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে, গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে গণবিপ্লবকে পেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় কর্মীবাহিনীকে নিজেদের তৎপরতার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করে নিতে হয়। সকল জনগোষ্ঠী সংগঠনের কর্মী বা নিয়মিত জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে না, তবে নিয়মিত জনশক্তির সংখ্যা ও মান এরকম হতে হবে, যাতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নিজ আদর্শের পক্ষে ও বিপরীত মাতদর্শের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়।
গণবিপ্লবের এ পক্রিয়াতে আদর্শ প্রচারের জন্য সকল মাধ্যমের (ব্যক্তিগত দাওয়াত, সামষ্টিক দাওয়াত, মিছিল, মিটিং, জনসভা, প্রেসমিডিয়া, ইলেক্ট্রেনিক্সমিডিয়া প্রভৃতির) সহযোগিতা নিয়ে আদর্শের পক্ষে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সম্মিলিত চেতনা

দাবিতে পরিণত হলে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ইসলামী বিপ্লব অর্জনের জন্য গণবিপ্লবের প্রক্রিয়া
সর্বোত্তম কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। জাহিলী এ সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র আন্দোলন এ প্রক্রিয়াকেই সময়োপযোগী পদ্ধতি বলে মনে করে। আমাদের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সে আলোকেই তৈরি হয়ে আসছে।
ইসলামী বিপ্লব একটি সামগ্রিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নাম। সমাজের সকল স্তরে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি অপরিহার্য-যারা ইসলামী বিপ্লব ও তৎপরবর্তী ইসলামী সমাজ পরিচালনার নেতৃত্ব দিবেন। সমাজ ও প্রশাসনিক কাঠামোর নেতৃত্ব তৈরির সাথে সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার পরিবর্তনও নিতান্ত প্রয়োজন, যা এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত হওয়া খুবই সহজ। যোগ্য নেতৃত্ব ব্যতীত ইসলামী বিপ্লব তো]দূরের কথা, ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক কাঠামো পরিচালনাও সম্ভব নয়। তাই আমরা বাস্তবমুখি পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী কর্মসূচী হাতে নিয়ে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে চাই।
বিপ্লবের নামে অদূরদর্শী কোন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীতে আমরা বিশ্বাসী নই। তবে আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে বাতিলের পক্ষ থেকে যেকোন ধরণের বাঁধা কর্মীবাহিনীকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গণবিপ্লবের পথ বেয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সংগ্রাম সশস্ত্রবিপ্লবের রূপ নিতে পারে। আবার আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে এমনটির প্রয়োজন নাও হতে পারে। সময়ই তার সচিত্র প্রতিবেদন বলে দিবে।

গণবিপ্লবের যৌক্তিকতা

গণবিপ্লব সমাজবিপ্লবের একটি পরিভাষা। গণবিপ্লব বলতে সমাজ পরিবর্তনের সে পদ্ধতিকে বুঝায়, যে পদ্ধতি আদর্শের পক্ষে গণদাওয়াত, গণচেতনা ও গণদাবীর ভিত্তিতে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি করে। অনেকের ধারণা ইসলামী বিপ্লব মানেই সশস্ত্রবিপ্লব। গণবিপ্লবের অস্তিত্ব ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নেই-এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে সূরা নাছরে
ইরশাদ হয়েছে-
অর্থ : ''যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় তখন আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।"
আয়াতে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি রক্তপাতহীন বিজয়। এ বিজয়ের মধ্য দিয়েই দীন পরিপূর্ণতা পায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এজন্যই মক্কা বিজয়কে ফাতহুম মুবিন বা চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বর্ণনাতে স্পষ্টই

বুঝা যাচ্ছে যে, দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে স্বেচ্ছায় সমবেত হয়েছে। কাউকে জোর করে বা বলপ্রয়োগে বাধ্য করা হয়নি। আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের মাধ্যমেই চূড়ান্ত বিজয়ের পথ রচিত হয়েছে।

অতএব, একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, সকল সফল বিপ্লবের ক্ষেত্রে গণবিপ্লবের পথ পরিক্রমা উপস্থিত ছিল।

রাসূল (স.)-এর সমাজবিপ্লবেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যদি বলা হয় রাসূল (স.) অস্ত্রের জোরে ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষমতায় সমাসীন হয়েছেন এবং লোকসমাজকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করেছেন, এ কথা চরম ভুল হিসেবে প্রমাণিত হবে। বরং এটাই ইতিহাসে স্বীকৃত সত্য যে, উদারতা, মহানুভবতা ও আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। ইসলামী বিপ্লবের প্রাথমিক ধাপেই বিপ্লবকামী মানুষগুলোর চিন্তার জগতে পরিবর্তন আসে তথা মানসিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। নির্যাতিত জনগোষ্ঠী নিজেদের মুক্তির জন্য যখন ইসলামকে একমাত্র জীবনাদর্শ হিসেবে মেনে নিবে, তখনই ইসলামী বিপ্লব সম্ভব হবে। রাসূল (স.) সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে দাওয়াত, হিজরত, জিহাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতি যত কর্মসূচী পালন করেছেন, সকল কর্মসূচীই গণবিপ্লবের পথ পরিক্রমার অংশ। রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় সর্বমোট যুদ্ধের সংখ্যা ৬৬টি এবং এসব যুদ্ধে মুসলমান ও কাফিরদের মোট মৃত্যু সংখ্যা এক হাজারেরও কম।

এই যদি হয় ইতিহাসের সত্যতা–তাহলে ইসলামী বিপ্লবকে রক্তাক্ত বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করা এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নির্দেশিত জিহাদকে প্রচলিত যুদ্ধের সাথে তুলনা করা আদৌ কি সমীচীন হবে? ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের ইতিহাস গণবিপ্লবের উজ্জল দৃষ্টান্ত বহন করে। একইভাবে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা সকল জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা ও সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এসবের বিপরীতে যদি প্রচলিত যুদ্ধের হতাহতের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়, তাহলে রাসূল (স.)-এর সমাজবিপ্লবের গণমুখিতা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফরাসী বিপ্লব, কমিউনিষ্ট বিপ্লব, ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধসহ সকল পট-পরিবর্তনই রক্তসাগর রচনা করেছে। তথাপিও একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সকল পরিবর্তনের পক্ষেই জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া ও অংশগ্রহণ ছিল। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে এসকল পরিবর্তনের ভিত্তিও গণজাগরণ। অতএব প্রমাণিত সত্য যে, গণবিপ্লবের ভিত্তির ওপর সকল সফল বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

সাম্প্রতিক আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অনেকেই বাংলাদেশে সশস্ত্রবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন। এটা নিঃসন্দেহে চরম অদূরদর্শীতা ও বাতুলতার বহিঃপ্রকাশ। আফগান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও অতীত অবস্থা পর্যালোচনা করলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, মুক্তিকামী মানুষগুলো প্রতিষ্ঠিত জালিম ও

তাগুতের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে অবিরত জেল-জুলুম ও ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে; বাতিলের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজেদের তিলে তিলে নিঃশেষ করেছে। শুধু নির্যাতন-নিপিড়ন নয়; আন্দোলন সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে শাহাদাতের সুধা পান করতে হয়েছে অগণিত আল্লাহর বান্দাদের। এত কিছুর পরই জালিমের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় মাজলুম জনগোষ্ঠী অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়েছে। অতএব, আফগান সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তিমূলেও নীরবে কাজ করছে গণবিপ্লবের এক দীর্ঘ পথ।

সময়ের আহ্বান

আমরা মনে করি, জাহিলী সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রামে শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, সত্যানুসারী ও মুক্তিকামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। দল-মত, বর্ণ-গোত্র, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মুক্তিকামী ছাত্রসমাজের মুক্তির মিছিল ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন। সাংবিধানিক পরিবর্তনের আমৃত্যু সংগ্রামে উৎসর্গিত এ কাফেলা লড়ে যাবে আপসহীনভাবে। রাজনীতির মাঠে আমাদের বিচরণ থাকবে, তবে প্রচলিত রাজনীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে নৈতিকতা ও আদর্শিক বিসর্জন দিয়ে বাতিলের সাথে আপসকামীতায় আমরা বিশ্বাসী নই। সকল মুসিবতের মোকাবেলায় আমাদের মুখে উচ্চারিত হবে কুরআনে কারীমের সে বাণী–

অর্থ : "আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কর" (সূরা নাহল, আয়াত : ৩৬)

আমরা ডাকি তাদেরকেই, যারা সত্য প্রতিষ্ঠায় সদা নির্ভীক। সুখে-দুখে সর্বদাই আমাদের বক্তব্য এক। যারা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য চরম দুর্দিনে ও হাসিমুখে তৈরি থাকবে, শত প্রলোভনেও যারা সত্যের পথে থাকবে দ্বিধাহীন, জীবনের বিনিময়েও এ পথে যারা থাকবে অটল-অবিচল, আমরা তাদেরকেই আহ্বান করি।